মণিপুর : আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও শর্মিলা চানু

উৎপল বসু

ব্রিটিশ বণিকদল প্রথম ভারতে আসে ১৬০৮ সালে, গুজরাটের সুরাটে। তাদের প্রতিনিধি উইলিয়ম হকিন্সের মাধ্যমে তৎকালীন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে দরবার করে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের অনুমতি পায় ব্রিটিশ বণিকরা। ভরতবর্ষে ব্রিটিশ বণিকদের পদার্পণের দেড়শ বছরের মধ্যেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িশ্যার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে এবং ক্রমশ সারা দেশের কর্তৃত্ব চলে যায় তাদের হাতে। এই সময়ে ভারতবর্ষ বিভিন্ন রাজা, জমিদার, জায়গীরদারদের মাধ্যমে শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এদের বলত 'নেটিভ স্টেট'। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই 'স্বাধীন' রাজ্যগুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণেই রাজ্য চালাত ৫৫৪টা নেটিভ স্টেট। গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী সুপ্রাচীন মণিপুর রাজ্য ছিল এমনই এক নেটিভ স্টেট এবং অ্যাংলো-মণিপুর যুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৮৯১ সালের ২৫ এপ্রিল তা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে।

উপনিবেশের তীব্র মুক্তিসংগ্রাম এবং প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে এই বিরাট সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রাখা যে কার্যত অসম্ভব তা বিংশ শতকের ৩০-এর দশক থেকেই স্পষ্ট হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে। ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫ সালে পাস করে ভারত শাসন আইন (Government of India Act 1947) এবং একই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act 1947)। ১৯৪৭ সালে এই আইন অনুসারে ভারতবর্ষ দুটো 'ডোমিনিয়ন'-এ—ভারত এবং পাকিস্তানে বিভক্ত হবে এবং নেটিভ স্টেটগুলো তাদের খুশিমতো যেকোন একটি ডোমিনিয়নে যোগ দেবে অথবা সার্বভৌম (Sovereign) রাষ্ট্র হিসেবে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখবে এবং এই আইন মোতাবেক ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট শেষ রাতে ব্রিটিশ এজেন্ট জিপি স্টুয়ার্ট মণিপুরের মহারাজা বোধচন্দ্র সিংহের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন।

এই ক্ষমতা হস্তান্তর পর্বের আগে, ১৯৪৭ সালের ১ এবং ৪ জুলাই ব্রিটিশ রাজের পক্ষে ব্রিটিশ প্রদেশ গ্রেটার আসামের গভর্নর আকবর হায়দারির মধ্যে এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে মণিপুরের নিজস্ব সংবিধান দ্বারা পরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবার কথা। যদিও সেখানে একজন রাজা থাকবেন। এবং এরই ধারাবাহিকতায় মণিপুর স্টেট কনস্টিটিউশন ১৯৪৭ তৈরি হয় ও সেই সংবিধান অনুসারে ১৮ জুলাই ১৯৪৮-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৫২ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এই ৫২ জনের মধ্যে ১৪ জন কংগ্রেসের, ৫ জন মণিপুর কিষান সভার, ৩ জন সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৮ জন ছিলেন নির্দল এবং ১২ জন প্রজা শান্তি সভার। প্রজা শান্তি সভার ১২ জন জনপ্রতিনিধি এবং

১৮ জন নির্দল তৈরি করেন প্রথম সরকার ও এই সরকার কাজ শুরু করে ১৮ অক্টোবর ১৯৪৮ সালে। এ দিনই মণিপুরের প্রথম সংসদে (Legislative Assembly) স্বাগত ভাষণ দেন রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান মহারাজা বোধচন্দ্র সিংহ। লক্ষ্য করার বিষয়, ৫৫৪টা নেটিভ স্টেটের মধ্যে একমাত্র মণিপুরই একটা সংবিধান তৈরি করে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এক বছরের মাথায় ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর শিলং-এ বোধচন্দ্র ভারত সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে ভারত ও মণিপুরের মিলন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বোধচন্দ্র এই চুক্তি স্বাক্ষর করলেন কেন, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। অনেকে বলেন জোর করেই বোধচন্দ্রকে দিয়ে এই চুক্তিতে সই করানো হয়। আর একটা মত হল বোধচন্দ্র ৫ লাখ টাকার বার্ধক্য ভাতার বিনিময়ে স্বেচ্ছায় চুক্তি সই করেন। কিন্তু এই চুক্তি মণিপুরের নির্বাচিত সংসদের অনুমোদন পায়নি। বরং ২৪ সেপ্টেম্বর মণিপুরের সংসদের তৃতীয় অধিবেশন (Session) এই চুক্তি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। এবং সেই সঙ্গে মহারাজা বোধচন্দ্রের হাত থেকে আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসন, অর্থ, বৈদেশিক সম্পর্কের দায়িত্ব কেড়ে নেয়। তবে এই চুক্তিকে সামনে রেখেই দিল্লির সরকার ১৫ অক্টোবর ১৯৪৯-এ এক আদেশ জারি করে—মণিপুর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। মণিপুরের ভারতভুক্তি কিন্তু মণিপুরি জনগণের মধ্যে ব্যপক ক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং ২৮ এবং ২৯ অক্টোবর ইম্ফলে এক কনভেনশন আয়োজন করে এর তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

মণিপুরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের যে লড়াই তার প্রেক্ষাপটটি এই। এই অধিকার অর্জনের সংগ্রাম দমনের জন্যই সেনাবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৫৮ (AFSPA) মণিপুরে প্রয়োগ করা হয়। এই আইনেরও আবার একটা ইতিহাস আছে। লোকসভা এই আইনটি পাস করার আগে আলোচনার জন্য ব্যয় করেছিল মাত্র তিনটি ঘণ্টা আর রাজ্যসভা চার ঘণ্টা। আসলে আলোচনা করারও বিশেষ কিছু ছিল না—১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন দমন করার জন্য বড়লাট লিনলিথগো যে অর্ডিনান্স [Armed Forces Special Power Ordinance (1942)] ব্যবহার করেছিলেন, বর্তমান আইনটি তারই কার্বন কপি। এই আইন মোতাবেক আইন শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে শুধুমাত্র সন্দেহের বসে যে-কোন মানুষকে হত্যা করা যায় (ধারা ৪-এর ক), আটক এবং তল্লাসি করা যায় ওয়ারেন্ট ছাড়াই (ধারা ৪-এর গ এবং ঘ)। এই আইনের ৫ নং ধারা মোতাবেক কোন মানুষকে বন্দী রাখা যায় অনির্দিষ্টকাল—বিনা বিচারে। এই বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৪-এর ক ধারা ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারার (Article 21)-এর সরাসরি বিরোধী, যেখানে বলা হয়েছে—কোন মানুষকেই জীবনের অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আরো মজার কথা হল, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে শুধুমাত্র হত্যার অপরাধেই কারুর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। অথচ এই ভয়ঙ্কর আইনে (ধারা ৪-এর ক) পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েত ব্যর্থ করতে বা আগ্নেয়াস্ত্র বহন প্রতিরোধ করতে গুলি চালিয়ে হত্যা করতে পারে সেনাবাহিনীর কোন কমিসনড্ অফিসার। এবং এই আইনের বলেই মণিপুর সহ গোটা উত্তরপূর্বাঞ্চল ও কাশ্মীরের জনগণের ওপর সামরিক বাহিনী নির্বিচার হত্যা, আটক ও ধর্ষণের মতন অপরাধ অবাধে করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে মণিপুরের থাংজাম মনোরমা দেবীর ধর্ষণ এবং হত্যা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অসম রাইফেলস-এর জওয়ানরা মনোরমা দেবীকে আটক করে ১১ জুলাই ২০০৪ তারিখে। তাঁর বামনকাম্পু

গ্রামের বাড়ি অসম রাইফেলস তল্লাসি করে মধ্যরাতের পরে ও অ্যারেস্ট মেমো-তে সই করে মনোরমা দেবীকে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় কয়েকটা গ্রাম পরেই এবং দেহের নিম্নাঙ্গে ছিল অজস্র গুলির চিহ্ন। স্বভাবতই ধর্ষণের পরে ঠাণ্ডা মাথায় খুনের অভিযোগ ওঠে কারণ প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা ছাড়া নিম্নাঙ্গে এমন ক্ষত হওয়া অসম্ভব। অসম রাইফেলস সংঘর্ষে মৃত্যুর গল্প ফাঁদে চিরাচরিত কায়দায়। কিন্তু হেফাজতে থাকা এক বন্দি কীভাবে এমন প্রাণঘাতী সংঘর্ষে জওয়ানদের সঙ্গে জড়াবে তার কোন ব্যাখ্যা মেলে না। এই ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হয় গোটা মণিপুর। অসম রাইফেলসের দফতরের সামনে মণিপুরি মায়েরা নগ্ন প্রতিবাদে সামিল হন। এই প্রতিবাদ কাঁপিয়ে দেয় গোটা ভারতকে।

কিন্তু এই ঘটনার পরেও আফস্পা প্রত্যাহার করেনি দিল্লি। এমনকি সামরিক বাহিনী সামান্য সংযতও হয়নি। ২৬ আগস্ট ২০০৭-এ মহম্মদ আয়ুব খান নামে এক ব্যক্তিকে একটা গাড়ি থেকে আটক করে অসম রাইফেলস। এবং ৩০ আগস্ট জানানো হয় যে সংঘর্ষে আয়ুব খানের মৃত্যু হয়েছে। এমন অজস্র ঘটনা রয়েছে। সামরিক বাহিনী নিজেই জানাচ্ছে যে শুধু ২০০৭ সালেই তারা জঙ্গি সন্দেহে ৭৭১ জনকে আটক করে এবং ১১১ জনকে হত্যা করেছে। ২০০৮-এর হিসেব থেকে জানা যাচ্ছে যে মণিপুরে ১৪,০০০ পুলিশ এবং অন্তত ৫০,০০০ জওয়ান মোতায়েন রয়েছে। মানবাধিকার কর্মীদের হিসেবে, মোটামুটি ২০ জন নাগরিকের জন্য একজন জওয়ান রয়েছে মণিপুরে।

এই ভয়ঙ্কর আইনই প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন মণিপুরের জনগণ। শুধু মণিপুর কেন, কাশ্মীর থেকে মণিপুর—যেখানেই আফস্পা বলবৎ সেখানেই এই ভয়ঙ্কর আইন প্রত্যাহারের দাবি উঠেছে। এবং এই দাবিতেই ২ নভেম্বর ২০০০ থেকে অনশন চালাচ্ছেন ইরম শর্মিলা। তাঁকে বারবার গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু শর্মিলাকে টলানো যায়নি। শর্মিলা আজও অনশনে। মণিপুর বার বার উত্তাল হচ্ছে এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে। এই দাবিতে গলা মেলাচ্ছেন ভারতীয় জনগণও। গোটা ভারতের কাছে শর্মিলা আজ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস-বিরোধী লড়াইয়ের প্রেরণা।

লক্ষ্য করার বিষয় হল ভূমিপুত্রদের ইচ্ছার তোয়াক্কা না করে মণিপুরকে ভারতের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাদের দূরেই সরিয়ে দিয়েছিল ভারতের শাসকবর্গ। কিন্তু আজ আফস্পা-বিরোধী লড়াইয়ের ময়দানে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে দৃঢ় হচ্ছে মণিপুরি জনগণের সঙ্গে ভারতীয় জনতার সংহতির সূত্র।

এই সংহতি যত দৃঢ় হবে, ততই ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বিদেশি বহুজাতিক ও দেশি দালাল পুঁজির লুণ্ঠনের রথের গতি রুদ্ধ হবে। □

ঋণ স্বীকার (ইন্টারনেট সূত্রে প্রাপ্ত) :

1. Walkhom Damodar Singh, *Forced and Unratified Manipur Murder Agreement of 21 Sept. 1949.*
2. Malem Mangal Laishram, *AFSPA, 1958—A Historical Perspective—Celebrating 60 years of Indian Democracy and 50 years of the AFSPA.*
3. Human Rights Watch, *These Fellows Must be Eliminated.*